কিছু মায়া রয়ে গেলো

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলিকাতা-বারো

প্রকাশনায়

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ ঃ ১৩২, ১৩৩ কলেজস্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—বারো

মুদ্রণে

মালবিকা দত্ত

এশিয়া মুদ্রণী

এ ঃ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—বারো

প্রচ্ছদ শিল্পে

বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী-১৯৬০

সূ চি প ত্র

কিছু মায়া রয়ে গেলো

ধনপতি সওদাগর গেলেন বিদেশে।
লহনা খুল্লনা সব পড়ে রইলো দেশে ॥
স্বর্গের নর্তকী খুল্ল তারামালা নাম।
নির্দেশে মর্ত্যের গর্ভে করিল সুনাম ॥
খুল্লর অনেক গুণ, অতীব রূপসী।
সেই দেখে ধনপতি হলেন উদাসী ॥
করিলেন বিয়া তাকে সপত্নী লহনা।
বুঝালেন লহনাকে কেমন খুল্লনা ॥
চন্দনকাষ্ঠের জন্য বাণিজ্যেতে যান।
ধনপতি সওদাগর জাহাজ ভাসান ॥
জাহাজ চলিল দেখে কমলে-কামিনী।
সিংহলরাজের কাছে দিল বার্তাখানি ॥
দিল ধনপতি বার্তা, না দেখাতে পেরে।
বন্ধ রইলো বহুকাল তার কারাগারে ॥
শ্রীমন্ত, নির্দেশে পুত্র, চলে অভিযানে।
মঙ্গলচণ্ডীর কৃপা সিংহলেতে টানে ॥
শ্রীমন্ত দ্যাখেন ঐ কমলে-কামিনী।
সিংহলরাজের কাছে দেন বার্তাখানি ॥
না দেখাতে পেরে মন্ত কারাগারে যান।
সেখানে দ্যাখেন বন্দী পিতাঠাকুরাজ ॥
মঙ্গলচণ্ডীকে তথা করেন স্মরণ।
সিংহলের রাজা দোঁহে ছাড়েন তখন ॥
দুর্বলা দাসীর নাম, খুল্লনাকে করে।
লহনার চক্ষুশূল, ঢেঁকিশালে পোরে ॥
সেথায় শয়ন আর ছাগল চরানো।
খুল্লনার এইমতো কাজ হইল শোনো ॥
ফিরে এসে ধনপতি এইসব দেখে।
ভর্ৎসনা করেন লহনাকে কাছে ডেকে ॥
বোঝেন লহনা সব দোষ দুর্বলার।
বিদায় করেন তাকে খুলে সিংহদ্বার ॥
আবার আবার যান ব্যবসায়ী ধনা।
শ্রীমন্তকে সঙ্গে নেন হয়ে একমনা ॥
শ্রীমন্ত বলেন, দ্যাখো ঘুষুড়ির ট্যাঁকে।
বেঁধেছেন গোরা বেনে নাও এক ফাঁকে ॥
মাঝিরে শুধিয়ে জানে, যাবে কলিকাতা।
চানক সাহেব নাকি কাপ্তান ও মাথা ॥
গোরা যাবে সুতানুটি সমস্ত লুটিবে।

আপামর সাধারণ্যে কিছুই না দিবে ॥
গরিব মরিবে এবে গোরার দংশনে ।
শ্রীমন্ত ধনপতি দোঁহে ভাবে মনে ॥
তাছাড়া ব্যবসা করি, গোরার সহিত ।
ধনা ভাবে বস্তুগত আছে কিবা হিত ॥
শ্রীমন্ত ও ধনপতি ভাবে তবু মনে ।
যাবে সুতানুটি আজি চানক পিছনে ॥
নব মনসার পালা গাঁথে শক্তিনাথ ।
পিছনে অবশ্য আছে চণ্ডীমার হাত ॥

স্বপ্ন, তোমাদের প্রতি আর

স্বপ্নের কোথায় শেষ ? স্বপ্ন, তোমাদের প্রতি আর
চোখ ফেরাবো না, আমি কোনোদিনও চোখ ফেরাবো না ।
হাতের অনর্থ হাতই ভেঙে দিয়ে করে সমাহার,
জীবনই জীবন ভাঙে, মৃত্যু তারে কখনো ভাঙে না ।

তোমরা আমার দোষই দাও বারেবার, আমি দোষী ।
ও ভালোবাসার মর্ম বুঝতে পারগ না হলেও
ক্ষতি কি আমার ? তোমরা ওকে দেখো, বলো না রাক্ষসী,
প্রেতিনী, খলের সেরা । ওর কাছে ঋণী তা সত্ত্বেও !

ঋণ কিছু কম নাকি একবার মিলিত দৃষ্টিতে ?
ঋণ কিছু কম নাকি বুকের শুষ্কতা ভিজে গেলে ?
উৎসন্ন ক্ষেতের শস্য যদি ঘাস্ ; বিচারে, বৃষ্টিতে
দুষ্য ; কী-যথেষ্ট তবে, এই বুকে ভালোবাসা পেলে ?
স্বপ্নের কোথায় শেষ ? স্বপ্ন, তোমাদের প্রতি আর
চোখ ফেরাবো না, আমি কোনোদিনও চোখ ফেরাবো না ।

প্রেমশূন্য

ভালোবেসেছিলাম একদা, তাও কি হাওয়ায়
ভেসে যাবে ? তাও কি উৎপন্ন
করবে স্রোত ? আমার চাওয়ায়
এবং প্রাপ্তিতে হবে ধন্য ?
একী ভিখারীর ভিক্ষা নয়,
একী ভগ্ন ভঙ্গিমা তোমার—
ভূত, ভয়, অন্ধকার-হারা ?
ভালোবেসেছিলাম একদা, তাও কি হাওয়ায়
ভেসে যাবে ? তাও কি ফলতঃ প্রেমশূন্য ?

বালুকায় ভেঙে পড়ে সমুদ্রের...

বালুকায় ভেঙে পড়ে সমুদ্রের ফসফরাসের আবিল নক্ষত্রপুঞ্জ---
মাছ জানে, বালুকা জানে না, দূরের দৈনিক চাঁদ চোর-পুলিশ খেলেছে কতই
ও-পাড়ার কদম্বের তল ছেড়ে, সমুদ্রে তোমার।
তোমাকে কি ভালোবাসে চাঁদ ঐ বালকের মতো ?
সফেন সমুদ্রে তুমি নক্ষত্রেরও বিছানা পেতেছো,
তুমিও কি ভালোবাসো দূরত্বের প্রতি নিমন্ত্রণ ?
তুমিও কি পুরুষের মতো, কোনো পুরুষ দেখোনি—
রামগড় ইস্টিশন, ফেল্ট্-টুপি উড়েছে মৌসুমে
হাজারিবাগের দিনে ট্রেন যায় ব্যর্থ সিটি হেঁকে—
তুমিও কি ভালোবাসো, যারে ভালোবাসে বারবার !
বালুকায় ভেঙে পড়ে সমুদ্রের ফসফরাসের আবিল নক্ষত্রপুঞ্জ—
মাছ জানে, কেহই জানে না, দূরের দৈনিক চাঁদ নানাবিধ খেলার অতীত।

ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা

হৃদয় স্মরণাতীত কাল থেকে জানে এ-হৃদয় চোর নয় বালুচরে কাঁকড়ার
মতন নয় দ্রুতগামী
ধূর্ত বা ঝড়ের আনন্দে নয় দিশাহারা মেধাবী প্যাঁচার মতন কখনো
নয় এ হৃদয়
এ-হৃদয় থেকে উড়ে উড়ে গেছে ঘুড়ি অন্ধকার মাঠের ওধারে ভীতভাবে
এ-হৃদয় থেকে গেছে সব বি. এন. আর ট্রেন ভালোবাসা সম্বলপুরের
এ-হৃদয় থেকে গেছে মদ্যপান জিহ্বায় বিহ্বল গল্প,
পানসিগারেটজর্দাবেশ্যাদের নির্লিপ্ত চুম্বন
এ-হৃদয় থেকে গেছে ছেলেদের মুখের মতন নির্মলতা, অভিষেক যৌবনের হায় !
হৃদয় বলিয়া যাহা আছে তারে দোকানের ছাতা একাকী ঢাকিতে পারে
হৃদয় বলিয়া যাহা আছে তারে একাকী কাটলেট ওজনে হারাতে পারে
গোলাভরা তেমন হৃদয়গুলি আজ মানুষের থেকে অরণ্যে বাসের দিকে চলে গেছে
এখন হৃদয় বলে ধরা হয় স্তনের ওজন
পুরুষের স্তন নাই, স্তনের ওজনও নাই ঠিক, তাদের হৃদয়ও নাই বিধিমত।
পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা অথচ আসিতেছে—ট্রামে, বাসে,
এরোপ্লেনে, ট্রেনে, হেঁটে, চিঠিপত্রে মোহে
হে অনবরত তবু নিমন্ত্রণ আছে মানুষের
মানুষের বড় কাছে সমস্ত অনাথ সমসাময়িক মানুষেরা অনেক আশায়
ধীরে ধীরে আসিতেছে—মানুষ কি মেয়েমানুষ চায় ?
আজ সেই বালকেরে চুম্বনের দিন হয়ে এলো
অন্ধকার হয়ে এলো
ঘুড়িগুলি উড়ে উড়ে যোগ্যতর অন্ধকারে দূরে যেতে চায়
পৃথিবীর পুরাতন জানলায় কতমুখ দ্রুত ট্রেনের ছবির মতন আবেশমাখা হতে থাকে
স্মৃতিগুলি কবেকার ২য় মহাযুদ্ধের বিমানের ক্রন্দনের মাঝে যায় ঝরে
রঙের যোগ্যতা আমি অন্ধকারে বহুবার বহুবিধ করে বক্তৃতায় কবিতায়
ছবি এঁকে বোঝাতে চেয়েছি
আমার মায়ের কোলে বসে-দেখা সিনেমায় বোমারু বিমান এল কেঁদে
যায় ঈগলের মতো
ঈগলের নখে-বাঁধা সিন্ধুবাদ নাবিকের দেশ আমি দেখেছি তোমাতে
হৃদয় তোমাতে নয়, হে বালক তোমাতেও নয়,
ঈগলের অতিক্রূর পাখার ভিতরে আমি দেখেছি স্বদেশ—আমিও তো মরে যাবো !
বরং স্বদেশ, তোমার মৃত্যুও নাই, তুমি অনশ্বর, শুধু হাত-ফিরি হতে পারো,
ভাষার বদল হয়ে যেতে পারে, কোনোদিন মারা তো যাবে না
মানুষের মতো দুঃখ দিতে আর পারে না কেহই—
নিষ্ঠুরতা জানে বটে মানুষই, তাই যুদ্ধ করে। বাঘে আর কত মারে মানুষেরে
যতো মরে বাঘ !
মানুষই মানুষে মেরে শেষ করে দিয়ে যায়, হাল্কা করে দিয়ে যায়

পৃথিবীকে, অনেক পিছনে ফেলে দিয়ে যায় হায়
যুদ্ধ না ঘটিত যদি সৃষ্টি থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের, তাহলে স্বর্গের চেয়ে
সত্য উচ্চতর
কোনো দেশে আমরা নিতাম স্থান
মৃত্যু তো স্বর্গেই হতো, পৃথিবীতে নয়
পৃথিবীই পরিচালনা করত স্বর্গের দেবতাকে।
আজ বিংশ শতাব্দীতে ভেবেছিলাম, যুদ্ধ দেখবো না—মানুষ মানুষে খায়
দেখবো না—স্বর্গেরে নামাবো
পৃথিবীর অনেক গভীরে নীচে পরাজয়ে তারে স্থান দেবো
মানুষের ভালোবাসাপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্ল্যাটিনাম
সহৃদয় শিক্ষাহীন কবিরে কবির রাজা গ্যেটে
কবিসভা পার্লামেন্ট, শিল্পী ও ভাস্কর সভ্যতার—
শান্তি দাও, শান্তি দাও, মানুষের হৃদয় ফিরিয়ে দিয়ে যাও,
হৃদয় স্মরণাতীত কাল থেকে জানে এ হৃদয় চোর নয় বালুচরে
কাঁকড়ার মতন নয় দ্রুতগামী।

২

তোমারে দেখিতে আমি নদীতীরে কান পেতে থাকা বালুকায়
হেঁটে হেঁটে অনেক অনেক দূর চলে গেছি
তোমারে দেখিতে আমি বটের শিকড়ে স্থূল স্বাস্থ্যবান মাটির
উপরে শুয়ে দেখিয়াছি
অঘ্রানের মাটির ভিতর হতে ভেসে আসে চাঁদ লালা ও জ্যোৎস্নায়
মাখা অসহায় উলঙ্গ অনাথ তরল শিশুর মতো।
ভালোবাসো ? গাছের কাটার 'পরে স্তম্ভিত পিঁপড়ের সারি
গাছের জীবন নাই দেখে
ওদের ক্রন্দন থেকে পৃথিবীর গভীর গভীরতর বিপদের সূচনার
সূত্রগুলি কত আর্তনাদ করে টের পাওয়া যায়—
ভালোবাসো ? ওদের মতন তুমি ভালোবাসো কিনা পৃথিবীর সকল মানুষে আজ,
কিশলয়ে ?
ওদের ক্রন্দন থেকে ভেসে আসে ভাষাময় বিপদের আগুনের ধোঁয়াগুলি
ওদের ক্রন্দন থেকে টের পাওয়া যায় মানুষের ঝলসানো গন্ধগুলি,
বারুদ-পীড়িত
ওদের ক্রন্দন থেকে ভেসে আসে মোরগের আকণ্ঠ বিহ্বল গান ভোরবেলা
ওদের ক্রন্দন তাই ছেলেখেলা নয়
ওদের ক্রন্দন থেকে লালরঙ ছড়ায় আকাশে, পশ্চিমে ডিমের সাথে
মানুষের সৌভাগ্য ক্রমশ আঁধারে বিলীন হয়, চেনো নাকি ?
এরকমভাবে সব কুমারী হইতে কুমারেরা পলায় বাসনা হতে ছাড়া পেয়ে
এরকমভাবে সব বিধবার-ই ভাগ্যলিপি লেখা হতে থাকে

অবলা চোখের জলে মনোমত
এরকম নৈঃশব্দ্যের তুলনা কোথাও হয় নাক' ।

তোমারে দেখিতে আমি নদীতীরে কানপেতে থাকা বালুকায়
হেঁটে হেঁটে অনেক অনেকদূর চলে গেছি আজ !

তোমার জামা

নূতন একটি জামায় আমি ঢেকেছিলাম দেহ
চারিদিকেই প্রবল সন্দেহ—
অই জামাটি তেমন নূতন নয়।
হতেও পারে, সকল পরাজয়
যখন নিকটবর্তী—তখন অবলা এই দেহ
জামার দর্পে জয়ী হবার স্বপ্ন দ্যাখে যদি
তখনও নয়—আমার ভীষণ জ্বরে
তুমি এসে ওষুধ দিও ঢালি—
তোমার দেহে জামার কথা কেহ
আলোচনাই করে না কোনোদিন।

এই যে নিত্য নতুন খেলার সঙ্গী

এই যে নিত্য নতুন খেলার সঙ্গী-সাথী
কুড়িয়ে আনা
এই যে নিথর রাত পোহালেই স্বচ্ছ সকাল
দিচ্ছে হানা
তার মানে কি ?
'কোথায় ফাঁকি ? কোথায় ফাঁকি ?'

জীবনটারই সঙ্গে থাকি
নখ দিয়ে আজ করছি কানা
মৃত্যু, শুধুই কুড়িয়ে আনা
ম্লান জোনাকি !

ঐ তো দূরে
হলুদ চাঁদটি উঠছে ফুঁড়ে
মেঘের সিঁড়ি
আমরা শুধুই পাত্‌ছি পিঁড়ি
উঠোন জুড়ে
হলুদ চাঁদটি উঠছে ফুঁড়ে
—অর্থ নানা !
এই যে নিত্য নতুন খেলার সঙ্গী-সাথী
কুড়িয়ে আনা
এই যে নিথর রাত পোহালেই স্বচ্ছ সকাল
দিচ্ছে হানা
তার মানে কি ?

এখানে থাকে না অনিমেষ

আঙিনা বিষণ্ণ হয়ে আছে।
এখানে থাকে না অনিমেষ
আজকাল, বস্তুত নিজেই
জ্বালিয়েছে পিতৃপরিচয়।

বড় বেশিদিন বড় সুখে
ছিল, তবু কপালে সইলো না,
তাকে যে কে টেনেছে ভিতরে
তাকে যে কে টেনেছে বাহিরে,
তাই তার ঘর-ভদ্রাসন
আজ শুধু ঝোপঝাড় বন,
স্মরণীয় হঠকারিতায়
কখন বিভুঁয়ে চলে যায়,
পুড়ে পুড়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষ—
এখানে থাকে না অনিমেষ।

পৃথিবীরই ব্যাপকতা

এ নয় নগরে যাওয়া পথ খুঁড়ে গৃহেরই পশ্চাতে
কিংবা কখনোই নয় জেগে থেকে বসন্তের রাতে
কোকিলের কণ্ঠ শোনা। এ যেন সমস্ত কিছু ছেড়ে
বাসনায় ভেসে-আসা, কূলাকূলে নৌকা তবু ভেড়ে!
মনোভূমি ছেড়ে এসে বনভূমি আমাকে কী দেবে
আমার তা চিন্তা নয়। ছায়া নামে গাছ থেকে ভেবে?
একেই সারল্য বলে—একে বলে সর্বসমর্পণ
অতীতের যতো দেখা বারংবার দ্যাখে শুধু মন;
দেহ দ্যাখে ভবিষ্যৎ— তাই এই বদ্ধপরিকর
উচাটন ভেসে-আসা। এ-তুমুল সাঁতারে কি চর
পাওয়া যাবে কোনোদিন? বনভূমি? বৃক্ষে ভালোবাসা?
কোকিলের কণ্ঠ শুনে বসন্তের রাতে বড়ো আশা
জেগেছিলো, যাকে শুধু প্রেম, পুরাতত্ত্ব বলে নয়
পৃথিবীরই ব্যাপকতা, সুপ্তি বলে জেনেছে হৃদয়।

ধর্মদাস

মানুষের জন্যে নয়, আমি তারই জন্যে ব'সে আছি।
বিশাল শস্যের ক্ষেতে আজ প্রাক্-সন্ধ্যার লাঞ্ছনা
পদে পদে, খোঁড়লে, ঐশ্বর্যভার যেন বা স্ফুরিত অগ্নিশিলা
এ-ছাড়া বিপুল মাঠে কেউ নেই, যোজনা সংহারে
বুক থেকে ক্ষিপ্ত মণি, মরকত, দিয়েছে ছড়ায়ে।
মেতেছে চৈত্রের হাওয়া, দূরে দূরে নিহত বনানী
তেমনই নিবিষ্টচিত্ত, ঈষন্নীল কেবল আকাশ ;
ক্ষেতের জগৎ জুড়ে বিনা জলে অজরা সবুজ।

মানুষের জন্যে নয়, আমি তারই জন্যে বসে আছি
এ-প্রান্তে টিলার পর, ঠাণ্ডা, ঘন, বাদামছায়ায়—
ওদিকে দুচোখ তুলে, কালরুদ্ধ, শকটবিহীন
স্বপ্ন প্রকৃতির পাশে ; ক্রমাগত পদচ্ছাপ রেখে
নরনারী গেছে, মারী, ভালোবাসা, শিল্পেষণা লাখে।
নীলিমা নীলিমাপ্রান্ত গ্রাস করে, জাগ্রত-চেতন—
উঠানে শতাব্দাবধি, অন্তরে শতাব্দাবধি দেখে—
বড়ো স্তব্ধ, ব'সে আছি ; দূরে প্লাবনের মতো স্ফীত
অটুট মেঘের ধারা নেমে আসে, স্বর্গ থেকে মাঠে ;
শুরুতে সংশয়হীন, আমারই বুকের বালি, ঘাসে !

হলুদ সিংহ

হলুদ সিংহ নিয়ে আমার সেই খেলা কি দুপুর রাতে খেলতে হবে
টিকিট কাটো। শস্তা করেই দিচ্ছি—নিছক হাত বাড়ালে।
রীতিমতন শস্তা হবে, গ্রুপ্‌-টিকিটে মস্ত হলুদ সিংহ পাবে
আস্ত মানুষ গিলছে একা, চুপ্‌সো গালে
মস্ত মজা! মস্ত মজা! টিকিট কাটো।

আমার ঘণ্টা দুয়েক হয়তো খরচ হবে কিংবা জীবন—
হবেই বা কি? একটি জীবন, একলা জীবন সিংহ খাবে।
হবেই বা কি?
তোমরা টিকিট কাটলে বলেই মরতে পাচ্ছি!

বাতাসে অলকা চুল খোলে

বাতাসে অলকা চুল খোলে
তীব্র জিভ পিপাসার শেষে
ফিরেছে স্বদেশে
শান্ত জল গূঢ় রলরোলে
বাতাসে অলকা চুল খোলে ।

প্রদর্শনী, সাবানের ফেনা
বাগানের ক্লিষ্ট হাসনুহেনা
সমস্ত বিফল
গূঢ় রলরোলে শান্ত জল
...দোলে
বাতাসে অলকা চুল খোলে ।

তাৎক্ষণিক, হোক তাৎক্ষণিক
সাঁতারে প্রবৃত্তি কেন্দ্রাতিগ
...হ'লে
বাতাসে অলকা চুল খোলে ॥

আমার ছায়া আমায়

আমার ছায়া আমায় করে আঘাত !
ভিতরে যাই বাহিরে যাই তখন করে আঘাত,
যেন সে চায়, আমার মরে যাওয়া...
যেন সে চায়, আমার ফাঁকা হাওয়ায়
দুহাত তুলে একক জেগে থাকাই...

আমার ছায়া আমায় করে আঘাত !

ওদের ছায়া আমায় করে আঘাত
রক্ত খেয়ে আঁচায় আর দুপাশে চোখ নাচায়
হাড়ের কাঠি ভয়াল লাঠি কাদের মেরে বাঁচায় ?
ওদের ছায়া আমায় করে আঘাত !
বলার মতো কিছুই নেই, যখন নিজ বাঁহাত
নিজেরি ডান হাতকে দেয় কামড়
স্কন্ধকাটা, আপন দোষে পামর !

নিজস্ব কাঁথাটি যেন রঙিন দর্পণ

আমার উপায় নেই, তাই আমি জ্যোৎস্নার ভিতর
ব'সে এক কাঁথা বুনি লাল-নীল-হলুদ সুতোয়
সর্বক্ষণ ; যতটুকু জ্যোৎস্না পাই মেখে নিই আর
ব'সে থাকি, যেন বা শৈশব থেকে এই কাজ বর্তেছে আমাকে ।

আর কোনো কাজ নেই, পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রহের ভিতর
যতো কাজ, তার মতো অন্য কোনো কাজ নেই আজ—
শুধু ব'সে থাকা, শুধু কাঁথা বোনা—হিংসা দ্বেষ ছেড়ে
এই বন, এই সত্য জটিল-সোহাগে মুখ দেখা
মুখ-দেখে-চলা...
নিজস্ব কাঁথাটি যেন রঙিন দর্পণ !

দুদিকে

দুদিকে দুই বন্ধদ্বারের বুকটি তখন পুড়ছে,
একটি মানুষ পালিয়ে যাবার গর্তখানি খুঁড়ছে।
দেয়াল আছে ছিদ্রবিহীন, ঘরখানা তাই আস্ত
ঘরের চূড়া নামছে নিচে হঠাৎ ভালোবাসতে।

এই যে, এসব ভালোবাসার বাঁধন বড় শক্ত,
দেহটি সবসুদ্ধু তোলে জলস্তম্ভ রক্তে।
এই আছে আর মুহূর্তে নেই— ভস্মবাশি উড়ছে—
দুদিকে দুই বন্ধ দ্বারের মধ্যে হৃদয় পুড়ছে ॥

একলা ঘর

তখন তোমার একলা ঘর
আমার চারদিকে সব পর
আমার সবদিকে সব পর
এবং একলা তোমার ঘর

একলা ঘর অন্য অনেক ঘরের মতন নয়
তার ভিতরে স্তব্ধ তোমার কিসের স্বয়ম্বর ?

এখানেই মনে হয় স্তব্ধ

মনে হয় সুখে আছি এই হিংস্র বনের ভিতর
দুঃখ দাঁতে করে নিয়ে উদ্ধত হয়েছে গাছপালা
জ্বালা সব ধুয়ে গেছে সবুজ বৃষ্টিতে ঝড়ে মেঘে
আন্দোলন করে পাখি সন্ধ্যায় সকালে বায়ুবেগে।
খরগোস, ইঁদুর আছে, ছোটো প্রাণ নিয়ে আছে বুঁদ
এইখানে, ঝর্নাজলে ঝিকিমিকি মাছ করে খেলা
এখানেই মনে হয় স্তব্ধ হয়ে আছে ছেলেবেলা
বড় দুঃখী মানুষের মানুষীর সুখে-ভরা মন ॥

ভিতরে ভয়

ভিতরে ভয় ভাঙছে শুধু ভাঙছে
নদী যেমন বসতি ভাঙে নখরে
ভিতরে ভয় তেমন করে ভাঙছে
অথচ, ছিলো গড়ার ঠাটে-ঠমকে
জ্বলে ওঠার, হয়ে ওঠার বাসনা
ভিতরে ক্ষয় ভয়ের পাখা ভাঙছে
নদী যেমন বসতি ভাঙে নখরে
ভিতরে ভয় তেমন করে ভাঙছে।

দুঃখী গাছ, পাতাশূন্য গাছ

গাছে কোনো পাতা নেই, এলোমেলো ডালপালা আছে
ছিলো পাতা, উড়ে-পুড়ে গেছে, প্রকৃত সময়ে গেছে, ঠিকমতো গেছে
যেভাবে সমস্ত পাতা চলে যায়, সেইভাবে গেছে
কোনরূপ অন্যথা করেনি ।
বাধ্য ছেলেটির মতো চলে গেছে স্কুল ছুটি হলে
আগে-পরে নয়, ঠিক ছুটি হলে— গুলতানি করেনি,
চলে গেছে ।
ডালপালা আছে, আছে সবুজ নীরব রক্ত, দৃশ্যে বিষণ্নতা
বিশেষত কিছু গাছে এখন অসহ্য ফুল ধরে
তাই কষ্ট হয়, তার যে-ই দ্যাখে অদূরে দাঁড়িয়ে
কলকাতার পটভূমি জুড়ে এই হেমন্ত-পীড়িত
দুঃখী গাছ, পাতাশূন্য গাছ...
এলোমেলো ডালপালা আছে ।

এক টুকরো মাংস

এক টুকরো মাংসে পড়ে বেড়ালের থাবা।
নখ বেঁধে, রক্ত পড়ে সেই মাংস থেকে ;
অথচ, জীবনী থেকে সে বিচ্ছিন্ন আছে—
যেভাবে, সংসারে থেকে সন্ন্যাসীর গায়ে
অবিষয়ী আঁচ লাগে, এ মাংস তেমনই,
যখন সংলগ্ন ছিলো, রক্তই ছিলো না।
এই হয়, বোধকরি, তেজস্বীর কাছে
পাহাড় লোফার কষ্ট একদিন ছিলো না।
লুফে-লুফে লুফে-লুফে শিক্ষকতা পেলে—
আর শিক্ষকতা নয়—বোধ কাজ করে।
কাজ করে বটে, কিন্তু, বিবেচনা কর :
ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে দিলে পড়াবো নিশ্চয়।
আনকোরা গ্রন্থ নয়, ছেঁড়া পাতা পেলে—
মনোযোগ দিয়ে পড়ে ভালো মন্দ ছেলে !

পোকা

মন্দির চাতালে ওকে পোকায় কেটেছে।

পুরনো বাতিল খাতা ছিল এক পাশে
দ্যাখেনি, রেখেছে মাথা খাতার জঙ্গলে
ঘুম পেয়েছিলো তার, স্তব্ধের আরাম
শোয়ামাত্র পেয়েছিলো ব'লে ঘুমিয়েছে—
সে ঘুম ভাঙালো পোকা খর আক্রমণে!

অথচ, শরীরে তার হিলিবিলি করে
পোকা ও পাখির দল। পোকাটাই বেশি।
মন্দির চাতালে ওকে পোকায় কেটেছে!
কাটার কারণ ততো স্পষ্ট না হলেও
কেটেছে, খাতার মতো, রক্ত খাবে ব'লে
বেঁচে-বর্তে থাকবে ব'লে স্বচ্ছন্দে কেটেছে ॥

একাকী পুড়ো না

দুদিন বেড়াতে এসে পুড়ন্ত বিকেলে—
কেন পোড়ো ?
কথা দিয়ে কথাগুলি জোড়ো—
কেন পোড়ো ?
এদেশ তোমার খুবই চেনা,
সেকথা কি তুমিই জানো না ?
তুমি জানো।
সুন্দর সন্ধ্যায় ডেকে আনো
যাকে ভালোবেসেছিলে একদিন
সন্ধ্যায় ও রাতে।
জ্যোৎস্না যাকে চুরি করে
নিশ্চিত প্রভাতে,
ডেকে আনো।
একাকী পুড়ো না
কথার উপর কথা
একাকী জুড়ো না,
ডেকে আনো
একাকী পুড়ো না।

ভারি দুঃখ ওর

গলির কালোতে ও কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?
একা-একা উদাসীনভাবে—
কিছু কাজ শেষ করে এসেছে বোধ হয়
কিছু কাজ বাকি
মধ্যে অবসর উদাসীনতার এই ফাঁক
ভরাট করার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে !
গলির কালোতে ভালো মুখ ঢেকে
দাঁড়িয়ে রয়েছে
একা একা ভারি দুঃখ ওর ।

শাদা পাতা

শোকময় শাদা পাতা নিষ্পলক চোখের মতন পড়ে আছে
কোথাও মালিন্য নেই, কালির আঁচড় নেই কোনও,
দাগ কেটে যাবে বলে, অপদার্থ কবি,
লম্ফঝম্প ক'রে, খুবই কেঁদে-কেটে, এই অবস্থায়...
আজ ধুম জব্দ হয়ে বসে আছে, বাতিল জামার
মতন, আলনার পাশে। ব্যবহার, অভ্যর্থনা নেই।
অসহায়তার কালি-মাখা মুখ, ঠুঁটো জগন্নাথ,
জানে না দু পায়ে ভর দিয়ে উঠতে পারবে কি পারবে না!
শোকময় শাদা পাতা সাতিশয় শাদা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে...

বাঁশি একা একা

অসহ্য আগ্রহে হাতে তুলে নেয় বাঁশি,
বাজাতে জানে না, বাঁশি একা একা বাজে ।
পরিক্রম ছিলো খুব-ই শুধু বৃষ্টিপাতে
ধুয়ে-মুছে নদী হয়ে গেলো তুচ্ছ মাঠ ।

এই-ই হয় । অন্তরাল দৃশ্যমানতাকে
সমানে অগ্রাহ্য করে বেড়ে উঠতে চায়,
পরমুখাপেক্ষী প্রাণ খোসামোদ করে
বেঁচেবর্তে থাকতে চায় । কোন্ লাভ বেঁচে ?

অসহ্য আগ্রহে হাতে তুলে নেয় বাঁশি,
বাজাতে জানে না, বাঁশি একা একা বাজে ॥

দেরি নেই

আকাশের পুবকোণে আগুন লেগেছে—
নেভাতেই হবে ।
যে কোনো উপায়ে তাকে নেভাতেই হবে ।
না হলে সমূহ ক্ষতি মানুষের শিশুর নারীর—
কুঠারে শিকড় কাটলে গাছ মারা যাবে ।
মানুষ পরগাছা নয়
মানুষের হৃদয়ের জয়
ভীষণ বিপন্ন হবে ।

মানুষকে মানুষ বলে জন্তুরা চিনবে না,
সমূহ বিপদ হবে
যদি কিছু এখনই না করো ।
যা পারো এখনই করতে হবে,
বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে,
বাতাস উঠেছে
আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেরি নেই প্রান্তে ও প্রান্তরে

ছুঁয়ে যাচ্ছে

ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা, গাছের পাতা—শিরিষ পাতায় ।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে—
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায় ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে !
আকাশ ভরে আছে মেঘে
পাতার ভিতর বাতাস স্নেহে
বয়ে যাচ্ছে নিরুদ্বেগে, পরিহাস্যে
তার আমায় তো কথাই ছিলো
পরিবেশেই প্রকাশিলো, অনৌদাস্যে—
ছোঁয়ার পরম অর্থ আছে
হোক না ছোঁয়া শিরিষ গাছের
সরল ভাষ্যে
বোঝার যা সব বুঝেই নিলো
তার আসার তো কথাই ছিলো
এসেছে সে ।
ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা, গাছের পাতা—শিরিষ পাতায় ।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে,
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায়, ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে !

কোয়েল

সবুজ ভুরুর কোল ছাপিয়ে দুপুরে ইস্পাতের
ফালির মতন কোয়েল
বুক জুড়েছে বালির চাটাই, ছড়িয়ে কালো পাথর
পাথরচুড়োয় বকের শাদার মূর্তি কী তীক্ষ্ণতায়
অবলোকন করছে মাছের চঞ্চলতায় ফেরা
ইতস্তত নদীর জল চোখের জলের মতন।
সুখের চাদর জড়িয়ে রোদে নিমগাছের তলে
কবির মতন এক কারিগর বিরক্ত হাড় জুড়োয়
এতক্ষণে স্থির হয়েছে, পাথরে প্রগত
চক্ষু মেলে দেখছে স্নানের দুই কিশোরীর কমল
পাতার মতন চাদর ঢেকে দুই কিশোরীর কমল
কোয়েল জলের আদর কাড়ছে দুই কিশোরীর কমল
জলের ভেতর ছবি আঁকছে দুই কিশোরীর কমল!

ছুটির নিমন্ত্রণে

ওই বাড়িটিতে আমি একদিনই গিয়েছি
তাও পুতুলের সঙ্গে, একা একা নয় ।
চিনতে পারবো ? দেখা যাক । চিনে নিতে হবে ।
কারণ, শতাব্দী পরে তাহাকে দেখার
নিমন্ত্রণ আজ রাতে, আজ সন্ধ্যা থেকে
যতক্ষণ দেখা যায়, তাহাকে দেখার
নিমন্ত্রণ আজ ; এই বিশ বছর পরে ।
চোখের দেখার জন্যে ভূমধ্যবয়সে
নিমন্ত্রণ পাই আমি—মাধ্যম পুতুল,
যেতে হবে । প্রাণপণে চিনে নিতে হবে
বাড়িতে গিয়েছি আমি নিতান্ত একদিনই
আগে কি জানতাম, কোনো নিমন্ত্রণ পাবো ?
পুতুলের থেকে নয়, নিবেদিতা থেকে !
কেন এতকাল বাদে নিবেদিতা, তুমি,
আমাকে দেখতে চাও বলে ডাক দিলে—
প্রয়োজন আছে কিছু ? সমস্যা সংসারী ?
তাতেই বা আমি কোন্ পথে সমাধান
করতে পারি ? করা যায় ? হস্তক্ষেপ বলে !
ভেবেও, কিনারহীন লোভে গৌরী মাছি
'আছি আছি' বলি আর সর্বাঙ্গ জড়াই
জিরেন কাঠের রসে, কেননা, তোমাকে
আমারও বৃক্ষের মতো দেখতে ইচ্ছা করে
অন্তত একবার, দেখলে, আরো একবার ।
ক্ষতি হবে ?
কার ক্ষতি ? ক্ষতি কাকে বলে ?
নিরুপম, ক্ষতি তুমি আমার করবে না ।
এতোই নিশ্চিত !
নিশ্চিত নিশ্চিন্ত আমি, ক্ষতি যা করেছো
কেবলি নিজের আর পারিপার্শ্বিকের
নিরুপম, এ-কারণে আজকাল রাতে
হঠাৎ ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে দেখি
তোমার সতৃষ্ণ মুখ, জান্‌লার ওপারে,
চাঁদের আলোয় ভিজে, ভুতুড়ে দৃষ্টির
মধ্যে ঘন অভিমান, নিশ্চিন্ত হবো না ?
কাল কোনো কাজ আছে নিবেদিতা, ভোরে ?
কেন বলো ? আছে কাজ, না করলেও হবে ।
তবে, চলো একবার ডাক্তারের কাছে—

অসীম, আমার বন্ধু, খ্যাত মনোবিদ
দেখাও একবার মন, মাথাটি দেখাও,
প্রণব কি এখনও খুব ট্যুর করে ?
নিরুপম, কোনোদিন তোমাকে বলিনি
ইয়ার্কি করো না, সত্যি বড় কষ্ট পাই,
আজকাল।
কতোটা বয়েস হলো ? রক্ত হলো হিম !
নায়িকা তেজহীন, এ কি মূর্তি দেখি
সম্মুখে আমার, দেবি, ভারি লজ্জা করে।

[অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত এই কবিতাটি সত্যসাঁই-এর অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকা দপ্তরে লিখিত]

তোমরা দেখো

বেগুনপাখি, বেগুনপাখি বসলে দাঁড়ে !
রাজমহলের কাঁখের কলস তিনপাহাড়ে—
ফেরাতে যাই হাওয়া এবং অগ্নিবরণ
মেজাজ-মর্জি । তোমরা দ্যাখো চার কাহারে
আমায় নিয়ে যায় না চলে আংরাভাসা
নদীর গোপন যদির কোণে ক্ষুৎপিপাসায়,
তোমরা দেখো ॥

ইচ্ছা তাই

যেন এক ষড়যন্ত্রে ফেলে দেখতে চায়
কাটতে পারি কিনা ফাঁদ !
অগাধ নদীর জল ফাঁদের ওপারে
প্রখর জলের টানে ভাসাও মুশকিল
কিন্তু যেতে হবে ।
ফাঁদ বাঁধ খরনদী পার হতে হবে
যেতে হবে
চলে যেতে হবে
সব বাধা কেটে-ছেঁটে পার হতে হবে,
ইচ্ছা তাই ।

এখন কিছুদিনের দোহাই

এখন কিছুদিনের দোহাই
দাও আমাকে, রোদটা পোহাই
দাবায় বসে, বিছিয়ে কাঁথা
মনকে আমার স্বর্ণ যাঁতায়
পেষাই ভালো, মনস্বী তোর
ভরাট করিস শুকনো গতর

কিংবা বিষে
যদি পোড়াস হৃদয়টা তোর, আমার কী সে ?
কিচ্ছুটি নয়
হাতে আমার অল্প সময়
হাফ-গেরস্ত বয়ঃসন্ধি
দারুণ দেহ ধন্দে করে নজরবন্দী !

আর একটু পেরুলেই

আর একটু পেরুলেই সন্ধে
কাজে মন দে
শেষ করাটা চাই
হচ্ছে, হবে, ভাই
কথাটা আজকের নয়
নিশ্চয়
তর্সু থেকে বাসি
গরিব-গুর্বোর হাসি
কিংবা বিয়ের কনে ফাঁদা...
আজকের দিনটা একটু আলাদা
আর একটু পেরুলেই সন্ধে
কাজে মন দে
শেষ করাটা চাই

সবুজের মধ্যে আছে

সবুজের মধ্যে আছে আকর্ষক প্রেম ও তৃষ্ণার
জোড়া ভুরু, প্রেম আছে সর্বত্রে জড়িয়ে,
যেও না ছড়িয়ে কেউ কালবৈশাখীর হাওয়া মেঘে
ছড়িয়ে দিও না আলো, এই ঘাস এই লুকোচুরি

মানুষ যেমন থাকে পারম্পর্যহীন পৃথিবীর
একপাশে, ভূলুণ্ঠন তার ভালো লাগে না কখনো
অন্যপাশে শুয়ে থাকে মরীচিকা পিতৃমাতৃহীন
শুয়ে থাকে প্রস্রবণ, শুয়ে থাকে পাথরের পাশে
একা হিম জল আর প্রাণাধিক স্পর্শের মতন
ভালোবাসা।

মুখখানি

ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে ধুলো, দেখি মুখখানি
পাতার আড়াল থেকে দেখি মুখখানি,
একা একা,
মুখখানি লক্ষবার দেখা,
মুখখানি কোটিবার দেখা
একা একা,
মুখখানি লক্ষবার দেখা।

ফিরে আসা

সন্ধ্যায় আক্রান্ত হলে তুমি
জানি আর ফিরবে না কখনো
আমায় বাজাতে হবে স্মৃতির ঝুমঝুমি
জানি আর ফিরবে না কখনো।
গেলে আর ফিরে আসা দায়
গেলে আর ফিরে আসা হয় না কখনো।

আয়না জুড়ে প্রতিচ্ছবি

আয়না জুড়ে প্রতিচ্ছবি, মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে
জানো তোমার গভীর অসুখ, মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে
দু'হাত ঢেকে আড়াল করো মুখের ঘৃণ্য সমস্তদিক।
তারপরে ঐ বুকের মধ্যে একটি দয়ার আসন ছিলো
তা সব ফুটো, দাবায় লুটোয় এক আদর্শ ফুলের মালা,
উদরে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি, জঠরে তার আগুন জ্বালা।
উদর থেকে উরুয় নামো, নামার ছিলো সরলগতি
সুজন্ম ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে ছিলো প্রাণপ্রগতির
বিষণ্ণ এক শিশুর পালক, সেই পালকে লাগে আগুন,
আয়না জুড়ে প্রতিচ্ছবি, তার তূনীরে লাগে না তূণ।

শুধুই বেঁচে থাকা

যখনি হই নিবৃত্ত, সেই দেয়ালখানির
অর্ধ তা সম্মুখে বসে, ভূমধ্যখান
বাকি অর্ধ মৌন এসে করস্পর্শ !
এই তো জীবন, কোলের সাধ ছিলো হে
জীবনের আরেক দিকে করস্পর্শ,
জীবনের ভূমধ্যে শুধুই বেঁচে থাকা
যেভাবে যা কিছু আছে আগলে রাখা
জীবনের ভূমধ্য শুধুই বেঁচে থাকা
বেঁচেই থাকা।

পিছনে তাকালে

সূচনা করেছো যদি
সমাপ্তিতে অবশ্য পৌঁছাবে।
এছাড়া তো মধ্যপথ
তাতে মন তোমার ভরবে না
সেই কবে থেকে তুমি চলে যাচ্ছো
পিছে তাকাচ্ছো না,
পিছনে তাকালে তুমি পরাভূত হবে।

গণ্ডি

নিষ্কলঙ্ক দুই হাত ।
দুই হাতে সাজিয়েছি তাকে,
ওষ্ঠে নিরিবিলি মাংস,
তাকে আমি সুস্পষ্ট পরশ
দিয়েছি আলোয় আর অন্ধকারে ।
বুকে রেখে বুক
বলেছি, কীসের ভয় ?
আর আমি এগিয়ে যাবো না—
এখানে লক্ষণ-গণ্ডি,
পার হতে পারিনি কখনো ।

নুড়ি

গাছ মানুষের মতো
আমার পাথর ছিলো ভারি,
এখন সে নুড়ি হয়ে ঝর্ণার একপাশে পড়ে আছে।
এখন সে কীটের মতন,
তবুও জীবন্ত নয় কীটের মতন,
এখন সে নুড়ি,
থুত্থুড়ি বুড়ির মতো
এখন সে নুড়ি।
পাথরের প্রাণ ছিলো কতো,
বহুকাল ছিলো সে জাগ্রত,
আজ মৃত নুড়ি!

একা

সম্ভ্রমের শেষ কথা, শেফালির গন্ধের মতন
একত্র, থমথমে।
বাতাস এসেই তাকে চারদিকে ভাসায়—
সুতরাং,
গড়ো অচলায়তন।
শেফালির গন্ধ যেন কোনোদিকে ছড়াতে না পারে—
আমি একা সেই গন্ধে স্নান সেরে নেবো।

উঠে দেখলুম

যতক্ষণ বাইরে না যাবার ডাক আসে
আমি ঘরে আছি।
বন্দীর মতো, ঘরের সব দরোজা জানলা বন্ধ করে
ওরা আমায় থাকতে বলেছে আজ !
বলেছে, আকাশের ডাকে সাড়া দিও না,
বাতাসের দিকে কান ফিরিয়ে রাখো,
তুমি বন্দী, মনে রেখো কথাটা।
কিন্তু, কী আশ্চর্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই
কার করতালির চোটে
আমার ঘুম ভাঙলো।
উঠে দেখলুম, এক আকাশ তারা আমায় দূর থেকে
হাতছানি দিচ্ছে কেবলি।

বৃষ্টির বাগানে

জলভরা মেঘ ঘোরে সারাদিন আমার আকাশে ।
বৃষ্টি পড়ে বাগানের প্রতি পাতা ফুলে,
মার্জনীয় অপরাধ করে এসে রুক্ষ খোলাচুলে,
প্রেমিকও তো বৃদ্ধ হবে একদিন আমার মতন ।

আমার নিকটে কিছু পাবার প্রত্যাশা নেই তার—
সুতরাং চলে ভেঙে আমার আঙিনা আন-ঘরে ।
আমি শুয়ে শুয়ে দেখি যা কিছু দুচোখে এসে পড়ে,
জড় ও পাথর হয়ে শুয়ে আছি বৃষ্টির অভাবে ।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি, চেতনায় তীব্র বৃষ্টিপাত ।
পুরনো দিনের মতো কাছে আসো, যদি রাখো হাত,
আমি হাত ধরে উঠে চলে যাবো বৃষ্টির বাগানে—
একবার অন্তত আজ বৃষ্টির বাগানে নিয়ে চলো ।

সুন্দর যেখানে

সুন্দর যেখানে থাকে, চিরকাল সেখানেই থাকে
স্থির ; শুধু মানুষেরা, শুধুমাত্র সৌন্দর্যপ্রেমীরা
ঘুরে-ঘুরে কাছে যায়, তার কাছে, সুন্দরের কাছে
একাকী, গোষ্ঠীতে নয়, গোষ্ঠীচক্ষু সুন্দর দ্যাখে না
সে কেবল দ্যাখে রূপ, তৃণভূমি প্রগাঢ় পাথর,
রূপ ঐ সুন্দরের কাছাকাছি আরেকটি অন্বয়—
সুন্দর যেখানে থাকে, চিরকাল সেখানে রয়েছে।

প্রকৃত কি শুয়েছিলে

কীভাবে যে মূর্চ্ছা যেতে হাতের উপরে—
তা কি মনে আছে ?
তারপর ফুল আনতে হতো,
বাগানের থেকে গন্ধফুল,
সেই গন্ধে জেগে উঠবে তুমি ।
সহসা সে-জাগরণ আমায় অবশ করে দিত,
প্রকৃত কি শুয়েছিলে হাতের উপরে ?
নাকি স্বপ্ন নম্র নিবেদনে আমায় ছলনা করে ফিরে-ফিরে যেতো
বারংবার—
প্রকৃত কি শুয়েছিলে হাতের উপরে ?

বৃষ্টিতে

বৃষ্টি পড়ে আমার বাগানে।
অসংখ্য ফুলের গাছ মুখাপেক্ষী হয়েছিলো তার,
জীবনে এসেছে তার ফুলের ঝংকার,
বাগানের ;
অজস্র পাতাও তার মুখাপেক্ষী ছিলো ;
ধুলো মুছে সবুজাভা বেরিয়ে পড়েছে,
বেরিয়ে পড়েছে সব স্মৃতির গৌরব
অর্থাৎ তোমার মুখ ভাসে বৃদ্ধ চোখে,
তোমার তরুণ মুখ ভাসে বৃদ্ধ চোখে,
বৃষ্টি পড়ে আমার বাগানে।

মানুষ ক্রূরতা নিয়ে কথা বলে

দুটি দেবদারু দিয়ে ডোম করে রেখেছি সম্মুখে
তার নিচ দিয়ে ঢোকে মানুষ সামনের বৈঠকঘরে
কথা কয়, কতো কথা, কিংবা তন্ময় হয়ে বসে
আলো দত্ত কৃত 'টেরাকোটা' দ্যাখে ক্ষণেক নির্জনে
গৃহস্বামী আসে কিন্তু পদ্য নিয়ে কথা হয় না কোনো,
পদ্য নিয়ে কথা হবে তার ঘরে মৃত্যু হলে পর
হয়তো বা, কথা হয় সহজ সরল ।
মানুষের ক্রূরতা নিয়ে কথা হয়, আলোচনা হয়,
আলোচনা হয় কত কষ্ট আজ মানুষ করছে—
সুখস্পর্শ টেনে নেয় কানাগলি আর রাজপথ ।

অগ্নিশিখা-রক্তাক্তহৃদয়

বাগান এখন দেয় চন্দ্রমল্লিকা উপহার ।
ডালিয়া ফোটেনি আজো, ছোটো গাছপালা হয়ে আছে
আরও কিছুদিন যদি শীত থাকে সে-কামনা করি—
তাহলে ডালিয়া ফুটবে, ফুটবে ফুল দুচার মরসুমী,
এখন বিদেশ থেকে আনা লিলি পাতা বিছিয়েছে—
কিছুদিন পরে ফুল ; গ্লাডিওলি এখনো ফুটলো না ।
না ফুটুক, বসন্তবাতে অগ্নিশিখা রাস্তার দুপাশে—
আকাশে ছড়িয়ে ডানা ফুটে আছে রক্তাক্ত হৃদয় !

ভুলভাবে সাজিয়েছে

ভুলভাবে সাজিয়েছে রহস্যময়তা কবিতাকে !
কবিতাকে কেন যেন অবিচল থাকতে দিয়েছে—
না, আমার পদ্য নয়, পদ্য জানে রহস্যের খড়,
তা চিবোয় সারাদিন সারারাত নিভন্ত যৌবনে।

এ-বৃদ্ধ সমান দড় কবিতা ও পদ্যকে বাঁচাতে,
কুমারী মেয়েকে লাগবে, ভেঙে তার অপ্রসন্নতা
নিয়ে আসতে হবে কাছে, তারপর প্রকৃত ঘটনা—
ঘটবে ও ঘটতে থাকবে, চুম্বন প্রথম দেবে *ঠোঁটে*,
তারপর নিচে নামবে স্তনস্থলে, দুভাবেই পাবে—
স্তনস্থলে আঁচিলের ভারি বাড়াবাড়ি

ভুলভাবে সাজিয়েছে রহস্যময়তা কবিতাকে !

এই বনভূমি ছেড়ে

এই বনভূমি ছেড়ে যেতে হবে আমাকে হরিণ—
তোমায় একাকী থাকতে হবে ;
প্রতিবেশী বৃক্ষমূল সে তোমার আহার্য জোগাবে,
আমাকে ফিরতে হবে লোকালয়ে মনুষ্য-আবাসে
তোমায় সুরক্ষা দেবে এই বনভূমি,
তুমি বনভূমি দেখে ক্লান্ত হবে,
প্রিয় মানুষকে চাইবে স্নেহপাশে বন্ধনে নিবিড়,
এই বনভূমি ছেড়ে যেতে হবে আমাকে হরিণ—
নিঃসঙ্গ জীবনে, লোকালয়ে ।

অতৃপ্তি

সমর্পণ করেছি দু হাতে,
তবু তার আত্মা তৃপ্ত নয়।
আর কোনভাবে পারি সন্তুষ্ট করাতে ?
সমর্পণ করেছি দু হাতে,
তবু তার আত্মা তৃপ্ত নয় !
সমগ্র করেছি সমর্পণ,
আর কিছু ছাড় নেই, বাকি—
অরণ্য নদীর সঙ্গে সমস্ত জোনাকি,
তবু তার আত্মা তৃপ্ত নয়।
মৃত মুখ চায় না কিছুতে—
অথচ জীবন্মৃত আমি,
দেবার কিছু তো নেই বাকি।

ভালোবাসা সব জানে

যাবার সময় হলো, তাই এ-উচ্চণ্ড ভালোবাসা—
ভালোবাসা ঘরে-বাইরে, ভালোবাসা দ্বিধাহীন জ্বর।
ভালোবাসা থেকে আসে রমণী-কিশোরী পরস্পর,
চুম্বনে কী মর্মতল তৃপ্ত করে আশা—
ভালোবাসা সব জানে, গোপনে আকণ্ঠ ভালোবাসা।
শুয়ে-বসে ভালোবাসা, ভালোবাসা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে,
পুরাতন হাসি সেকি নূতন নূতনতর হয় ?
স্পর্শময় ভালোবাসা দেহে লেগে থাকে সর্বক্ষণ,
নিষ্পাপ কিশোরী কীসে তীরবিদ্ধ—
ভালোবাসা সব জানে, ভালোবাসা অক্ষত-মোহন।

শুধু এই

সকল প্রতাপ হলো প্রায় অবসিত...
জ্বালাহীন হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে
কিছু মায়া রয়ে গেলো দিনান্তের,
শুধু এই—
কোনোভাবে বেঁচে থেকে প্রণাম জানানো
পৃথিবীকে।
মূঢ়তার অপনোদনের শাস্তি,
শুধু এই—
ঘৃণা নেই, নেই তঞ্চকতা,
জীবনযাপনে আজ যতো ক্লান্তি থাক,
বেঁচে থাকা শ্লাঘনীয় তবু।

প্রাসঙ্গিক

একটি মর্মরমূর্তি জলজ বেষ্টনে...
যুবাকালে দেখা গেলে হতো লোভ, প্রণয়স্থাপন-
এখন নিঃসঙ্গ তার জলজ যৌবন,
আমাদের কাছে।
বনে কিছু মরা ডাল আছে ;
জঙ্গলে বৃদ্ধের কাজ কম—
শুধু কিছু চোখে দেখা, কানে শোনা কিছু,
আক্রান্ত হওয়ার মতো কিছু কাছে নেই
বেশিদূর যাওয়াও বারণ,
বৃদ্ধশরীরের স্নায়ু টান টান ক'রে
সমাজের প্রান্তে আসা বড়ো প্রাসঙ্গিক—
এখন এ-সন্ধ্যাবেলা।

অন্যধরনের উজ্জ্বলতা

আমাকে উজ্জ্বল করে তোলে পাপ, অসমগ্রন্থনা—
কিশোরীর সঙ্গে থাকা রাত্রিদিন দিবসযামিনী ।
আমাকে বাঁচার অর্থ শিখে নিতে বলে,
আমার শিক্ষণ চলে শিশুর মতন
ছোটো ছোটো পা ফেলে পা ফেলে ।
আমি সযতন থাকি যাতে ভূপাতিত
না হই, আঁতিপাঁতি করে ওর সারা গায়ে তিল গুণে গুণে যাই
একান্নটি পদ্মফুল যেন আমি সংগ্রহ করেছি
এইভাবে একান্ন একান্ন বার চুম্বন করতে হয় ওর ওষ্ঠাধরে
সে যে কী আস্বাদ যার স্পর্শ পেলে বিদ্যুৎ ঝলকায়
আর তো সামান্য স্তনে দুটি হাত রেখে শুয়ে থাকি !

আনন্দ

বর্ষায় দোপাটি ফুটছে, চন্দ্রমল্লী সাজানো বাগানে,
চতুর্দিকে চারা হয়ে আছে।
মাধবীর কুঞ্জ ধীরে ধরেছে দোতলা,
জুঁই আছে, লবঙ্গলতিকা ;
নিচের বাগানে ফুটছে শাদা জবা, ও তো সম্বচ্ছর
ফোটে ও সাজিয়ে রাখে বাগানের সবুজ প্রকৃতি—
সবুজের অনটন অসহ্য আমার কাছে আজ।
শীতের বাগান জুড়ে কী ফুলের আস্ফালন হবে,
আমি মধ্যমাঠে বসে সকল সুঘ্রাণ নেবো নাকে,
জীবনযাপনে আছে আনন্দ আনন্দ !

মানুষ বাগান

বাগানে তো কতো ফুল, তার মধ্যে প্রিয় কৃষ্ণচূড়া।
দুরকম ফুল আছে—একটি হলুদ, অন্য লাল,
দূরদেশি রাখাল ছেলে নিয়ে আসে সন্তুষ্ট সকাল,
বাগানে তো কতো ফুল, তার মধ্যে প্রিয় কৃষ্ণচূড়া।

বর্ষায় ফোটে এ-ফুল, অন্যকালে পাতা জেগে থাকে।
সবুজ পাতাও হয় হলুদ এবং ঝরে যায়,
ফুলগুলি ঝরে যায় সময়ের গূঢ় আবর্তনে—
মানুষ বাগান থাকে পাশাপাশি, এবং থাকে না।

মৃত্যু এসে

পূর্বাঙ্গনাতে থাকি, আজকাল জানি না কেন যে
আবহাওয়া স্তিমিত হয়ে আসছে তার, সন্ধ্যার সময়ে
জনে জনে ডেকে-ডেকে শ্রান্তি কাটানোর সুধা পান করা রোজ
থেমে গেছে, প্রকৃত থামেনি, তবে কমে গেছে তেমন মচ্ছব—
দু-তিনটি মৃত্যু এসে গ্রাস করে গেছে সেই সদানন্দ ভূমি !

জঙ্গল আনন্দে ভরবে

গ্রীষ্ম শেষ, এবার বৃষ্টির পালা, বিদ্যুতের—
ডালে-ডালে ঠোকাঠুকি—জ্বলে দাবানল,
গ্রীষ্ম শেষ, এবার জলের পালা হলো তীব্রতর।
সেই জলে ফেঁপে উঠবে নদ বক্রেশ্বর,
স্নানার্থী ঝাঁপাবে জলে—শিশু ও কিশোর।
ঝাঁপ দেবে পাড় থেকে জলের উপরে···
বীরভূমের জলে কোনো কাদা নেই, শুধু বালি আছে,
বনের স্ফটিক পাখি আনন্দে কপ্‌চাবে—
'বউ কথা কও' ডাক আর্তি মুহুর্মুহু ;
জঙ্গল আনন্দে ভববে, মাতা বসুন্ধরা !

দেখলে না

ভোরের সৌন্দর্য তুমি মুছে নিতে দিলে ?
বৃষ্টিপাতে ধুয়ে গেলো গাছের উপরে রাঙা ধুলো,
গতকাল তুলেছিলে শ্বেতকরবীর ফুলগুলো,
স্তব্ধ ও স্তিমিত হয়ে পড়েছে সে-সমস্ত আজ ভোরে।

তুমি তো জেগেই ছিলে, উঠে বসলে না, সন্ধ্যা হলো ;
সারাদিন পড়ে রইলে মুমূর্ষুর মতো—
খেলে না দেলে না, শুধু শুয়ে রইলে কোন্ অভিমানে ?
এসেছে সে, ফিরে গেছে—জেগেও দেখলে না !

এই অগ্নিগর্ভ প্রেম

এই অগ্নিগর্ভ প্রেম যাবে কোনদিকে
যেদিকেই যাক আমি সঙ্গে করে নেবো
নেবো ও ফিরিয়ে দেবো অগ্নিগর্ভ প্রেম
যেদিকেই যাক আমি সঙ্গে করে নেবো ।
কিছুতে যায় না ভোলা মর্মরস্তবক
স্তবকে তো ফুল নেই, শুধু আছে পাথর প্রতিমা
প্রতিমার প্রাণ আছে, মৃত্যু নেই সে কোন্ কিংশুক
কিংশুকের মধ্যে আছে প্রাণমৃত্যু অকাল প্রযাণে ।

পাথর

দুঃখের সংগ্রহ তাকে বেঁচে থাকতে দিলো,
তিলেতিলে মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেয়ে,
লোকটা বেঁচে উঠলো, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি—
লোকটাকে বাঁচালো দুঃখ, মন্দভাগ্য আর
কুসুমকন্টক পথ, লোকটা হলো স্ট্যাচু।
হলো স্থাণু অধিকন্তু এক পা এগুলো না ;
স্থির হয়ে, স্ট্যাচু হয়ে, লোকটা দাঁড়ালো—
পলক পড়লো না চোখে, সমূহ পাথর !
দুঃখের সংগ্রহ তাকে পাথর করেছে।

দেওয়া-নেওয়া

দেবার যা ছিলো, দিয়েছো পুষিয়ে,
তুমি, মালবিকা, অন্তরগ্রীবা বাড়িয়ে দিয়েছো ।
যখন চেয়েছে পাখির মতন সেই গ্রীবা খুঁটে কি যেন খেয়েছে
চেয়েছে বলেই পেয়েছে দুগুণ, না গুণে দিয়েছো ;
দেবার ছিলো যা দিয়েছো পুষিয়ে—
একে একে বহু বহুতর ক'রে,
দেবার যা ছিলো দিয়েছো পুষিয়ে,
নেবার যা ছিলো, কিছুই নাওনি দুই হাত পেতে ।

যাবো বহুদূর

মালবিকা হাতে হাত রাখো, আমি
বহুদূর যাবো ।
তোমার সাহায্য বিনা এ-বয়সে হাঁটতে পারি না,
চলতে-ফিরতে কষ্ট হয় মালবিকা,
হাতে হাত রাখো ।
একটি চুম্বন দিও সকালের দান,
আমি তার সম্মানে এগুবো—
চাঞ্চল্য জাগবে এই বৃদ্ধ দেহে-মনে,
আমি হেঁটে চলে যাবো বহুদূর জঙ্গলে-পাহাড়ে--
কিশোর বেলার প্রিয় জঙ্গলে-পাহাড়ে,
মালবিকা হাতে হাত রাখো, আমি

যাবো বহুদূব ।

পেতে চাই

জরা ও জীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে চাই ।
হোক তা ক্ষণেকলভ্য, হোক বা তা তাৎক্ষণিক স্থায়ী,
জরা ও জীর্ণতা থেকে প্রকৃতই মুক্তি পেতে চাই ।
ঝরা পাতা নজরে না পড়ে,
হলুদ ও লোল বৃদ্ধ নজরে না পড়ে,
বসন্তের কাশফুলে কোঁচড় ভরেছি,
নজরে যা পড়ে তাকে বলে কিশলয়—
দুরন্ত যৌবন ফেরে আমাদের ঘরে ।

সন্নিধানে

ঈশ্বরের একটি ঘর আছে—
যাকে প্রেমের বন্ধনে ঢেকে ঢুকে রাখতে হয়

প্রেমের ঈশ্বর যাকে পছন্দ করেন
তাকে ডেকে নেন সেই ঘরে।

সেখানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে না
কেউ, সমভাবে থাকে।

সে এক সংসার ছেড়ে আরেক সংসারে
যাওয়ার মতন, তীব্র গূঢ় সন্নিধান!

মৃত্যুর ভিতরে আছে

মৃত্যুর ভিতরে আছে অদ্ভুত সাঁতার !
জলের ভিতর দিয়ে ডানা দুটি ভেজা,
আকাশ বিষণ্ণ নয়, বরং ফিরোজা,
মৃত্যুর ভিতরে আছে অদ্ভুত সাঁতার !

সঞ্জীবিত দুটি হাত জীবনের শ্রম
ছিনিয়ে সে-হাত করে পাথর অক্ষম ।
স্মৃতি ভালোবাসা রাখে পাথরের পাশে,
পুরনো দিনের স্বপ্ন যদি ফিরে আসে ।

মৃত্যুর ভিতরে আছে অদ্ভুত সাঁতার !
সে দীঘির পার নেই, পারাপার নেই,
জীবন সম্পূর্ণ হবে শুধু মৃত্যুতেই,
মৃত্যুর ভিতরে আছে অদ্ভুত সাঁতার !

চাই বদলে দিতে

হাঁটার ভঙ্গিটি চাই বদলে দিতে
বসার ভঙ্গিটি চাই বদলে দিতে
বদলে দিতে চাই পথ পদ্ধতিও,
বদলে নিতে চাই নিজে জন্মাবধি।

এঁকেবেঁকে রোদ পড়েছে জানলা থেকে
সোজা টেনে আনতে হবে মেজের উপর
শরীর দুটি আলাদা নয়, উপর্যুপর
চিন্তার ভঙ্গিটি চাই বদলে দিতে।

অনেকদিন একইরকম, ছিলুম একা
আজকে বহুজনের মধ্যে বিশিষ্ট হই,
নদীর মধ্যে ডুবো পাহাড় আমার দেখা—
পাথরবাটি পূর্ণ পাতি দম্বলে দই।

আত্মীয়তা

বাগানে ফুটেছে পিটুনিয়া,
সারবন্দী বেলি ও রঙ্গন,
লিলিও ফুটেছে বেশ—
সঙ্গে আছে কতো শ্বেতজবা।
বিকেলে এদের মধ্যে বসে থাকি
এদের সঙ্গেও কতো আত্মীয়তা হয়,
এর সুখ আমি জানি, দুঃখ কিছু নয়—
কেবলি এদের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়।

ক্ষুধাহীন

জড়ভরত হয়ে রইলে, আমার দিকে তাকালে না,
যেন একটি আধেকবোজা পাথর তুমি নদীর জলে—
গা ভাসানো খুবই কঠিন, আরো কঠিন ডুবে যাওয়া,
জড়ভরত হয়ে রইলে, আমার দিকে তাকালে না !

মানুষ তুমি বিস্ময়কর, জীবন নিয়ে করলে খেলা,
দু পা আগাও, তিন পা পিছাও মানুষ তুমি খেলা করলে···
সে খেলায় হারজিৎ ছিলো কি ? একজীবনের মানুষ তুমি,
হারলে জিতলে সমস্ত এক, তোমার কোনো ক্ষুধা ছিলো না ।

মেঘ তুমি

পাহাড়চূড়ার মেঘ তুমি কেন সোপর্দ বৃষ্টিতে ?
মেঘ হয়ে জমে থাকো অরক্ষিত বনে গাছে গাছে,
আমরা বসে ভোগ করি সেই শোভা পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে—
বারান্দায় বসে দেখি সবুজের সঘন পাঁচিল।
শুনেছি পাহাড়, আছে তোমার ভিতরে পশুপাখি,
কাঠুরেরা দেখে এসে আমাদের সেই গল্প বলে।
কতো পাখি কাছে এসে উতরোল করে উপত্যকা,
পশুরা বনেই থাক, মানুষ থাকুক পান্থশালায়
সেইই ভালো মেঘ তুমি নিষ্ঠুরতা ভোলাও বৃষ্টিতে ॥

বাউল

পৌষসংক্রান্তির মেলায় এক বাউলকে দেখেছিলাম—
গানের ঢেউ-এ সাঁতার কাটছে, উঠছে নামছে জলে !
শরীরখানা মুড়ে রেখেছে শতছেঁড়া কম্বলে,
পৌষা সংক্রান্তির মেলায় সেই বাউলকে দেখেছিলাম।
বাউল আমায় চিনিয়ে দিল জীবনমরণ খেলায়—
কাকে কখন রাখতে হবে, রুখতে হবে কাকে ?
পৌষা সংক্রান্তির মেলায় দেখলাম বাউলটাকে !

যেদিকে যাই

যেদিকে চাই মাঠ শুকায় নদীর ঘাট ছড়ানো বিল—
যেদিকে যাই পথ ছাড়ার পুরনো লোক !
নতুন শুধু হাততালি দেয়, সঙ্গ নিতে আসে না কেউ,
ভাসে না কেউ বানের জলে, বদল নামের নদী কোথায় ?

বদল যদি প্রকৃত হতো, সবাই এসে দাঁড়াতো পথে,
পথের পাশে বিপুল ভিড়, শোষণ নয়, হতো শাসনই ;
এখন আমি যেদিকে চাই মাঠ শুকায় নদীর ঘাট,
যেদিকে যাই পথ ছাড়ার পুরনো লোক !

উঠোনে-সমুদ্রে একাকার

কাঠচাঁপা ফুল পড়ে আমার উঠোনে।
শ্যাওলা রঙের জলে ভেসে আছে কত চাঁপা
সী-গালের মতো,
উঁচু-নিচু জল, ঢেউ, ইঁট, খোয়াগুলি—
একাকার হয়ে গেছে উঠোনে-সাগরে।

এ সমুদ্রে শব্দ নেই, কোলাহল নেই মাছেদের,
জেলে নৌকা ডিঙি নেই, শুধু কিছু কাঠের ভেলায়—
প্রবালের বহুবর্ণ টিপ জুড়ে আছে।
উঠোনে নিক্রান্ত কিছু বালতির জাহাজ।

আকাশী পাখির ছায়া পড়ে পিত্ত-জলে।
উঠোনেও অভিমান, উদাসীনতার বায়ু বয়—
নোনা মিঠে যাই হোক, তেতলার কার্নিশ চুঁইয়ে
উঠোনে রোদ্দুর নামে, জলে নামে, নামে পায়ে পায়ে।

ফুল কতো অন্তরঙ্গ

ফুল কতো অন্তরঙ্গ নিজেও জানে না—
জানে না বলে মরে, কাছে আসতে প্রাণাধিক ফুল ।
অথচ আমার মধ্যে ভিতরে-বাহিরে ফুলগুলি,
ফুল কতো অন্তরঙ্গ নিজেও জানে না ।

জানে না বলেই বসি কিছু দূরবর্তী ফুল রেখে
হাওয়া নেই, ঝড় নেই, তাই সেও দূরবর্তী থাকে ।
অথচ দেখার সেই চোখ থাকলে আমার ভিতরে
কতো ফুল ফুটে আছে, ভিতরে বাহিরে দেখতে পেতো
ফুল কতো অন্তরঙ্গ নিজেও জানে না ।

মানুষ তুমি একটি জীবন

পথ দেখানো সোজা, কিন্তু পথটি ভোলাই কঠিন,
মানুষ তুমি একটি জীবন তেমন কাজ করে বেড়ালে !
ভালোই ছিল মাটির জীবন, ভালোই ছিল কালো,
মানুষ তুমি বদল চেয়ে সেই কথাটি মনে রাখোনি ।

তুমি ভীষণ আলাভোলা, তুমি ভীষণ ভয়ংকরী,
তুমি মানুষ বদলে হলে পাথর, পথে পড়ে রইলে—
তুমি নদীর ভিতর গেলে, নাইতে নেমে কই ভেজালে
শরীর তোমার, পোড়া শরীর ? এখন নাওয়া ঠিক হলো কি ?

এখন বাগান

আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়
গিয়েছিল হেমকুসুম বছর পঞ্চাশ আগে হবে।
সেই থেকে অপেক্ষায় ছিল কবি, না হেম ফেরেনি,
গৃহত্যাগ করে গেছে অবহেলা তীব্র অভিমানে—
কবিকে বোঝেনি হেম, নিদারুণ প্রেমের হৃদয়!

আমার বাগানে আজ ফুল নেই, আছে অপেক্ষার
গাছ, চতুর্দিকে শুধু গাছপালা, লতা ও দেবদারু
কিছুকাল যাবে, তবে সাজাতে বাগান,
আরো বেশি চাই হিম, হিমেল বাতাস,
তবে আসবে মরসুমি সোহাগ জানাতে—
চন্দ্রমল্লী ও ডালিয়া, মটরের শুঁটি আসবে পরে,
এখন নেই-নেই করে আছে জবা, হাঁস-পা শেফালি,
তেমন ভুবনজোড়া আলোময় বাগানের ছিরি
বেরতে কিছুটা দেরি আছে।
আমার বাগান ভারি অনুতপ্ত হৃদয় এখন।

বাংলো থেকে বাংলোয়

চতুর্দিকে শিশু শাল মেহগনি গাছ
তারই মধ্যে বাংলোখানি গাছের ছায়ায়
পথ থেকে তেমন দ্রষ্টব্য নয়, নয় অট্টালিকা
সামান্য দুঘরা বাংলো জঙ্গল গিলেছে
গিলেছে বলেই ভালো—নাম ঘোড়াধরা
কেন যে এমন নাম ! প্রশ্নের উত্তর ফিরে আসে
নিরুত্তর বাংলা কিংবা সাঁওতালি ভাষায়

সেই ঘোড়াধরা বাংলো, বারান্দায় বেতের চেয়ার
স্টেশন বাজার থেকে বেশি দূরও নয়
অথচ জঙ্গলে ঢাকা। এই ঝাড়গ্রাম
শহরের ডানপ্রান্তে শহর জুড়েই দীর্ঘ শিশু আর সেগুন
মফঃস্বলে সহজে মেলে না।

ফিরে এসো মালবিকা

মালবিকা অইখানে যেওনাকো তুমি,
কথা কয়োনাকো অই যুবকের সাথে,
কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে ?
মালবিকা জানো তুমি ঘাসে কি লবণ ?
সামনে দেওদার বন, আমি বসে আছি।
ফিরে এসো মালবিকা কী সুস্বাদ এখানে, জীবনে—
ফিরে এসো মালবিকা যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর,
শান্তিনিকেতনে আমি দেখেছি পলাশ—
ফিরে এসো মালবিকা,
ও-পলাশে তোমাকে সাজাবো ;
রাঙা ধুলো দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো ;
ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো।
ফিরে এসো মালবিকা,
যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর।
এখানে মন্দিরে-মেঘে আশ্চর্য ঝংকার—
ফিরে এসো মালবিকা, ইচ্ছে করো, এখনই এসো !

অকাল বৃষ্টিতে

হঠাৎ অকাল বৃষ্টি শান্তিনিকেতনে।
রাতভর বৃষ্টি হল শান্তিনিকেতনে।
আমের মঞ্জরী পেল বৃষ্টি ও কুয়াশা।
বসন্তের মুখোমুখি শিমুল পলাশ।
ফুলটা বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়ে ঘাসে।
মানুষ স্থগিত ঘরেচক্রে বসে আছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে অমলকে আক্রমণ

অনন্তসমুদ্রে এসে খোঁজ পাবো, অমল অমল
চতুর্দ্দোলা—বধূ আছে দক্ষিণ দিগন্তে কোনোখানে,
নিভৃত আসনে, যতো কোলাহলহীন মঞ্জরীর
শেষ দেখা হয়ে গেল ফলগুলি নষ্ট হতে থাকে
মানুষের মেধা, প্রাণ এইভাবে নষ্ট হতে থাকে
পুনরাবৃত্তির দ্বারা শুধু কুৎসা হয়েছে সফল
প্রেম নয়, ভ্রান্তি নয়, নূতন নাটকও নয় কোনো।
অনন্ত সমুদ্রে এসে খোঁজ পাবো ? অমল অমল
তুমি সেই আগেকার অমলের কথাগুলি বলো—
বাহ্য নক্ষত্রের মাঝে নগরীব স্বাধীন আলোয়—
সেদিনের অমলের মুখখানি লুটাতেছে কোলে—
পারদ কাচের কোনো ভবিষ্যৎ মৌনের মতন পুরাতন
প্রাসাদেরও নির্বাসন লোকালয়ে হয়—
যা থেকে বর্মার কাঠ ভেঙে আনো মূল্যবান বলে
যা থেকে দেয়ালগিরি তুলে আনো ভাষায় মুখর
যা থেকে কিশোরী মৃগী তুলে আনো সম্পর্কস্থাপন
করো জন্ম—জন্মান্তর, ছেলেখেলা, বাঘের আসন
পাতো কুঞ্জবনে, ঘন অনুসার ভ্রমরে শোনাতে।
অমল অমল ডাকে দুপুরের সাহারাণপুর
সেখানে সমুদ্রে পাবো খোঁজ কিনা ? সাহারাণপুরে
টুরিস্টগাইড বলে রীতিমতো সমুদ্র তো নাই।
আমাদের বাল্যকালে অবান্তর সাহারাণপুরের
আওয়াজ, একজন আর কিছু নয়—ওরা বাল্যকাল
ওরাই কেবল ডাকে, মনে ধরানোর পশমের সবুজ সোনালি নীল জামাগায়ে
ওরা উপদ্রুত করে তোমার সাফল্য বিবাহেরও !
এখন তোমার মতো ভদ্রলোক যাবে হনিমুন, কখনো
মৃগয়া নয় রোমান্টিক যুবকের মতো
বন্ধুবান্ধবের সাথে বাৎসরিক মিলন হলেও
তুমি আর সেরকম ভাবে নাকি হবে আন্দোলিত ?
অর্থাৎ, তুমিই তার উত্তর শোনাবে এরপর—
লটারির অসম্ভব ভাগ্য পেলে মানুষে কী করে ?
কিংবা রত্নখনি পেলে কে করে কাচের কারবার ?
আমাদের এইসব প্রশ্নেরে বিমূঢ় করে দিয়ে
তুমি কোনো 'সৈয়দী-আদর্শ' স্থাপন করে যাবে !
এছাড়া অগণ্য আছে প্রশ্ন ও বক্তব্য, রাশিরাশি—
যা থেকে অন্তত আজ তোমায় নিষ্কৃতি দিতে চাই।

অমল ও স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ উপলক্ষে কবিতাটি ১১ জানুয়ারি ১৯৬৩-তে লিখিত।

অমিতদার জন্যে

এখন আছো যে পর্যন্ত, লম্বেতে তার দু'গুণ হলেই.
আমরা পায়ের তলে দাঁড়িয়ে কীভাবে আর দেখবো চূড়া ?
ছড়ার রাজার মুকুট মাথায়, সে মুকুট সুতীক্ষ্ণ বলেই,
আমরা তস্য ছায়ার মধ্যে হাতিয়ে পাচ্ছি খুদ ও কুঁড়া ।
ছোটো বড়ো সবার জন্যে তোমার লেখা ভোগ্যপণ্য,
খোলামকুচির মতন জলে তরতরিয়ে দিচ্ছে সাঁতার ।
বলতে-কইতে ও অ-মাইক, আমরা মঞ্চে হই বিপন্ন
কিন্তু তোমায় গাইতে বললে, নাচতে নাচতে মঞ্চ পাঁতাড় ।
এই সমস্ত গুরুত্বময় কাজের মধ্যে, আড্ডাধারী,
বিষয়, সেরেফ আড্ডা দেওয়া, গাড্ডা অদূর আদিগঙ্গা ।
রসগোল্লা পাক ইতরে, তোমার জন্যে রসের ভাঁড়ই,
যথেষ্ট, যথেষ্ট । আমরা পিঁপড়ে হয়ে তাই চাটেঙ্গা ।

একটু-আধটু জব্দ থাকলে, এক ছুটে যাই রিজেন্ট পার্কে,
কখন ভি পি, কখন ডি পি—কখনো যাই ভাড়া মিটিয়ে ।
যেন আসার কথাই ছিলো, এমন সহজ জল ছিটিয়ে
ঘরে ডাকলে—একাই ? ডাকো সঙ্গে আর কে ?

সাংবাদিক-লেখক অমিতাভ চৌধুরী

অজিত পাণ্ডে সহোদর প্রতিমেষু

সন্ধ্যার বন্দনা করে কণ্ঠলগ্ন গান ;
অন্ধকার আলো করে কূলপ্লাবী ঝড়ে—
কণ্ঠের জোয়ারে ভেসে যায় তটভূমি
শ্রাবণে-প্লাবনে মঞ্চে স্থির চিত্র ; তুমি
সহোদর, গান গেয়ে সুসংহত করো
যা কিছু ছড়িয়ে থাকা ; উৎক্ষিপ্ত সন্ন্যাসী-
চাপ সৃষ্টি করো ; যাতে বাধার পাঁচিল
ভাঙে, গুঁড়ো হয়, হয় তুচ্ছ ধূলিকণা ।

দেবুদার জন্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বয়সে প্রণম্য, তাই পা ধরতে কখনো কষ্ট নাই
তুমি আছো অগ্নীশ্বর তাই সেই দুখানি পদতল
আমারি বুকের মধ্যে তুমি রাখো, রাখবে না জেনেও
কষ্ট পাই, অসাধারণের মোহে আমাকে ছোটাওনি, তুমি
তুমি ভুলে গেছো সবই, তোমার কাজই কিছু ভোলা
তুমি ভুলে গেছো সবই, যে তোমাকে চিৎকৃত করেছিলো
তোমার পথই ভিন্ন, তুমি থাকো গৃহস্থের পাশে
বয়সে প্রণম্য, তাই পা ধরতে কখনো কষ্ট নাই।

এলিজি ১

(শংকর চট্টোপাধ্যায় স্মরণে)

তোমার ঘুম এলো

সুজনি-ঢাকা ঘুমের মধ্যে জানিয়ে এলুম, বিদায়
সন্ধেবেলা হঠাৎ-আসা, ঝড়তোলা বাগানের
ফুলগুলো সব পড়ে রইলো গাছের নিজের টানে—
সেই সেকালের স্বপ্নে-ঘুমে জানিয়ে এলুম, বিদায়
বিদায় সিঁড়ি আসনপিঁড়ি ওঠা এবং বসার
বিদায় পরমান্ন, রাঙা বেগুন কচি শশার
মিশ্র স্বাদ, পরমাদের মলিন ছেঁড়া জামায়
পড়লো টান, কখনো কান শোনেনি এই বাণী
—সুখে ছিলুম, আবার কেন তুমুল রাহাজানি !
আকাশ ভেঙে পড়লো ছাদে, কে কাঁদে, গান ? কেন
ডোবায় আর ভাসায় জল স্ফুরিত কোন ফেনায় ?
কেন এলুম অচেনা সব পেরিয়ে মিছু চেনায় ?
কেন এলুম ভাঙলো ঘুম, আবার ঘুম এলো ।
কেন এলুম, ভাঙলো ঘুম, তোমার ঘুম এলো ॥

এলিজি ২

নির্দিষ্ট ব্যথার দিন দেখা হয়েছিলো
অথচ কী হাসি ছিলো সম্মুখে আমার
রাজকীয় হাসি ছিলো সম্মুখে আমার
নির্দিষ্ট ব্যথার দিন ছিলে বর্ণনীয়
কেমন বর্ণনা দিই, তুমি ছিলে বসে—
নিভৃত, চেতনশূন্য—দেয়াল-দরোজা
সব ফাঁক, দূরে যাক—যাবে হাওয়া আগে
ঘনিষ্ঠরা কাছে নেই, তুমি ছিলে বসে
এক আকাশ ছায়া নিয়ে তুমি বসে ছিলে।

শুনেছি, সমুদ্রে ঢেউ তখনি উঠেছে
আয়ু যৎসামান্য, তার অগোছালো হাতে
কতটা যে বাঁচা যায়, তাই মারা গেলে
গোধূলির মায়া এসে তোমাকেই ছুঁলো—
কী তরুণ তপস্বীর মুখশ্রীকে আজ
চেতনসর্বস্ব রামকিংকরের মুখ

[এটি একটি অসমাপ্ত কবিতা। সমরেশ বসুর আকস্মিক প্রয়াণের পরে লিখিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে নেওয়া।]

এলিজি ৩

মধুক্ষরণের মতো প্রেম
[ঋত্বিক ঘটক স্মরণীয়েষু]

মৃত্যুর ভিতরে তবে পরিত্রাণ ছিলো !

বেঁচে-বত্‌তে থাকা নিয়ে বিড়ম্বিত ছিলে আজীবন ।
আলোকস্তম্ভের মতো আলো দিয়ে দেখাতে তীরের
কতো কাছাকাছি আছো, পদতলে ডুবন্ত পাহাড়—
সুতরাং, সাবধান ! যাত্রী ও তরণী সম্‌ঝে বাও ।
বামে বা দক্ষিণে যাও,
সম্‌ঝে বাও, সর্বনাশ আছে !
কী সর্বনাশিনী বিষ পান ক'রে মধুক্ষরণের
মতো প্রেম দিয়ে গেলে ভুল বাংলাদেশে—
অবিস্মরণীয় প্রেম দিয়ে গেলে ভুল বাংলাদেশে !

এলিজি ৪

উষারাণী দত্ত চিরস্মরণীয়াসু

মাতৃসমা ছিলে তাই ভূগর্ভে ধরেছো
আমাদের, ছিলে মাতা, তাই শেষ দেখা
হয়েছিলো আমাদের মহাপ্রয়াণের পূর্বদিনে
গড়েছিলে বসুন্ধরা, আমরা সেই কাজ
অক্ষুণ্ণ রাখবো বলে অঙ্গীকার করি ।
ফসল ফলাতে হবে, গাছ পুঁততে হবে,
সেই গাছ চিরস্মরণীয়া হবে আমাদের কাছে—
সেই গাছ পুঁতবো বলে তোমার বাসরে আজ আমরা
সম্মিলিত
হয়েছি সকলে, মাতা আশীর্বাদ করো
তোমার অক্লান্ত শ্রম যেন শীর্ষ পায়
একদিন ।

এলিজি ৫

রত্নার জন্যে

মা বলে ডেকেছে কেউ অম্নি ছুটে গেছো
সে তোর কেউ নয়, বুবুন নিখাদ ছেলেমানুষ
আর আছে ঝুমলি, তার বয়েস হয়েছে
এভাবে ডাকে না কাছে, নিজে ঘুরেফিরে কাছে যায়
আমরা যাই স্থিরলক্ষ্য আপন বোনকে পাবো বলে
কোলে কাঁখে পাবো, কাছে, সে বড়ো অসুস্থ থাকতো রোজ
কিন্তু হাসি অমলিন, মুখখানি শেফালির গন্ধে ভরা
সেই সুমলিন হাসি আমি দেখতে পারবো না বলেই
যাইনি, তোমার মৃত অতিজীবিতের হাতছানি
আমি ঠিকই জেনেছি গো, তাই মাঝেমধ্যে ফিরে আসি ।